‘গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধন এবং নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালীকরণ’ শীর্ষক
সংবাদ সম্মেলন

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩)

গত ২৫ জুলাই, ২০১৩ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (আরপিও) সংশোধনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন কতগুলো প্রস্তাব বিল আকারে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। এরপর ২৮ জুলাই কমিশন আরপিও’র ধারা-৯১ই বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়, যার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠে। পরবর্তীতে কমিশন, অবশ্য অনেক গড়িমসি ও বহু নাটক মঞ্চস্থের পর, এ আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। কমিশনের প্রস্তাবগুলো যাচাই-বাছাই করে কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধনসহ আইন মন্ত্রণালয় একটি খসড়া বিল ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ মন্ত্রিসভায় প্রেরণ করে। পরদিন মন্ত্রিসভা কিছু বিয়োজনসহ বিলটি অনুমোদন করে।

যথাযথ আইনি কাঠামো একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য। নির্বাচনী আইনের যথার্থতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতার জন্যও অপরিহার্য। তাই মন্ত্রিসভায় আরপিও’র খসড়ায় কী আছে তা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যেই আজকের এ সংবাদ সম্মেলন। প্রসঙ্গত, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নিয়ে যেন এক ধরনের অস্পষ্টতা বিরাজমান – মন্ত্রিসভায় কোন প্রস্তাবগুলো অনুমোদিত হয়েছে তার সুস্পষ্ট তালিকা এখনও পাওয়া যাচ্ছে না।

আইন মন্ত্রণালয় প্রেরিত খসড়ায় কমিশন আরপিও’র ২৮টি ধারায় ছোট-বড় পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছে, যার অধিকাংশই মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে বলে আমরা শুনেছি। অনুমোদিত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলো হলো:

(১) নিবন্ধিত দলের মনোনয়ন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা প্রদান ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের ক্ষমতা দলকে দেওয়ার লক্ষ্যে ‘প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী’র সংজ্ঞায় পরিবর্তন আনা হয়েছে (ধারা-২VI)

(২) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে সাজাপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অযোগ্য হবেন [ধারা-১২(১)(ন)]

(৩) মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জামানত বর্তমানে দশ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা করা হয়েছে (ধারা-১৩)।*

(৪) নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সভাপতি বা সেক্রেটারি বা অনুরূপ পদাধিকারী ব্যক্তি নিজে বা তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন বা তার পূর্বে দল কর্তৃক চূড়ান্তভাবে মনোনীত একজন প্রার্থীর নাম লিখিত নোটিশের মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারকে অবগত করবেন। এর ফলে দল কর্তৃক মনোনীত অন্য সব প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল হয়ে যাবে [১৬(২)]। বিদ্যমান আইনে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পূর্বে চূড়ান্ত প্রার্থীর নাম রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে।*

(৫) প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়সীমা ২৫ লাখে বৃদ্ধি করা হয়েছে [ধারা-৪৪খ(৩)]। বিদ্যমান আইনে এই সীমা ১৫ লাখ টাকা।

(৬) নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর লক্ষ্যে দলীয় প্রধানের বিভিন্ন আসনে সফরের খরচ তার নিজের নির্বাচনী খরচে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না [ধারা-৪৪গগ]।*

(৭) নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে কমিশনের লিখিত অনুরোধে যে কোনো সরকারি বিভাগে অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যে কোন ব্যক্তিকে অবিলম্বে বদলি করতে হবে [ধারা-৪৪ঙ(২)]।*

(৮) কোনো ব্যক্তি নির্বাচনে দুর্নীতিমূলক ও বেআইনি কাজে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বনিম্ন দুই বছর এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (ধারা-৭৩ ও ৭৪)। বিদ্যমান আইনে অন্যূন দুই বছর ও সর্বোচ্চ সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের এবং অনির্ধারিত পরিমানের অর্থ দণ্ডের বিধান রয়েছে।*

(৯) কোনো ব্যক্তি ভোট গ্রহণ শুরু হবার ৪৮ ঘন্টা পূর্ব ও পরের সময়ে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা চালালে এবং বিশৃঙ্খল ও সহিংস কার্যক্রমে জড়িত হলে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (ধারা-৭৮)।

(১০) কোনো ব্যক্তি নির্বাচনী কেন্দ্রের চৌহদ্দীর ৪০০ গজের মধ্যে ভোট চাওয়ার বা ভোট প্রদানে বাধা দেওয়ার কারণে অনূন্য ৬ মাস ও সবোর্চ্চ ৩ বছরের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা অর্থদণ্ড অতবা উবয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (ধারা-৭৯)।

(১১) নির্বাচনের দিনে ভোট কেন্দ্রের কাছাকাছি স্থানে লাউড স্পিকার ইত্যাদি চালালে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবার বিধান (ধারা-৮০)। বিদ্যমান আইনে অন্যূন ছয় মাস ও সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ডের এবং অনির্ধারিত পরিমাণের অর্থ দণ্ডের বিধান রয়েছে।*

(১২) কোনো ব্যক্তি ভোটকেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ভোট প্রদান ও গ্রহণে বাধা দানসহ আনুসঙ্গিক অপরাধের কারণে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (ধারা-৮১)। বিদ্যমান আইনে অন্যূন তিন বছর ও সর্বোচ্চ সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের এবং অনির্ধারিত পরিমাণের অর্থ দণ্ডের বিধান রয়েছে।*

(১৩) ভোট প্রদানে বাধা দান এবং কোন ভোটার কাকে ভোট দেবেন বা দিয়েছেন সে ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করার অপরাধে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। বিধান (ধারা-৮২)। বিদ্যমান আইনে অন্যূন এক বছর ও সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের এবং অনির্ধারিত পরিমাণের অর্থ দণ্ডের বিধান রয়েছে।*

(১৪) রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটানিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের ভোট গণনার গোপনীয়তা ভঙ্গের অপরাধে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (ধারা-৮৩)। বিদ্যমান আইনে অন্যূন এক বছর ও সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের এবং অনির্ধারিত পরিমাণের অর্থ দণ্ডের বিধান রয়েছে।*

(১৫) রিটানিং অফিসার, সহকারী রিটানিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যের কাউকে ভোট দানে প্ররোচিত, প্রভাবিত বা বাধা দানের অপরাধে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (ধারা-৮৪)। বিদ্যমান আইনে অন্যূন এক বছর ও সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের এবং অনির্ধারিত পরিমানের অর্থ দণ্ডের বিধান রয়েছে।*

(১৬) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি নির্বাচনী ফলাফল প্রভাবিত করার অপরাধে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের অথবা ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (ধারা-৮৬)। বিদ্যমান আইনে অন্যূন এক বছর ও সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের এবং অনির্ধারিত পরিমানের অর্থ দণ্ডের বিধান রয়েছে।*

(১৭) নিবন্ধিত দলকে ব্যক্তির পক্ষ থেকে দশ লাখ টাকার এবং কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ৫০ লাখ টাকার (বিদ্যমান আইনে ২৫ লাখ টাকার পরিবর্তে) অনুদান সীমা বৃদ্ধির এবং চেক দ্বারা প্রদত্ত অনুদান আয়কর মুক্ত হবে [ধারা-৯০চ(১)(ক)(অ)(আ)]। বিদ্যমান আইনে এই সীমারেখা যথাক্রমে পাঁচ লাখ ও ২৫ লাখ টাকা।*

* চিহ্নিত পরিবর্তনগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

এ ছাড়াও মন্ত্রিসভা আরপিও'র ধারা-১২, ১৪, ২২, ২৭, ২৮, ৮৭, ৮৯এ, ৯০বি-তে সামান্য পরিবর্তন এনেছে। তবে আমরা যতটুকু জেনেছি নির্বাচন কমিশন প্রস্তাবিত নির্বাচনী অপরাধ সংক্রান্ত ধারা-৭৩, ৭৪, ৭৮ ও ৮১ ধারায় পরিবর্তনের সুপারিশ মন্ত্রিসভা গ্রহণ করে নি। এর তাৎপর্য হলো যে, এ চারটি ধারার আওতাধীন অপরাধসমূহ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা যাবে না। প্রসঙ্গত, কমিশনের প্রেরিত সিল মারার সঙ্গে সঙ্গে ব্যালট পেপারে 'মার্কিং' করে ভোট দান করার কমিশনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয় গ্রহণ করে নি।

কমিশনের আরও দু'টি প্রস্তাব আইন মন্ত্রণালয় গ্রহণ করে নি, ফলে মন্ত্রিসভাও অনুমোদন করে নি, যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারে। প্রথমত, কমিশন নির্বাচনী ব্যয় মনিটরিং-এর প্রস্তাব করেছিল [ধারা ৪৪খ(৬)], যা মন্ত্রণালয় মন্ত্রিসভায় প্রেরণ করে নি। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নির্বাচনে টাকার খেলা আজ আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য সর্বাধিক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ টাকার প্রভাবেই এখন আমাদের জাতীয় সংসদ ব্যবসায়ীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে এবং আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যরবস্থা তার 'প্রতিনিধিশীলতা'র চরিত্র হারিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, প্রাসঙ্গিক কোনো তথ্য হলফনামায় গোপন বা আরপিও'র যে কোনো বিধান অমান্য করার অভিযোগে নির্বাচনী বিরোধের দরখাস্ত করা যাবে– এমন বিধান আরপিও-তে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব কমিশন ২৫ জুলাই আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত বিলে ছিল [ধারা-৫১(১)(খ)]। কিন্তু মন্ত্রণালয় এটি মন্ত্রিসভায় প্রেরণ করে নি। এখন প্রশ্ন হলো: এর ফলে কি এগুলো আর নির্বাচনী অপরাধ বলে গণ্য হবে না? এগুলোর বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নির্বাচনী ট্রাইবুনালের আশ্রয় নিতে পারবে না? তা যদি না করা যায়, তাহলে বিরাজমান– 'কালচার অব ইম্পিউনিটি' বা অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি অব্যাহত থাকবে।

মোটা দাগে পরিবর্তন

উপরে উল্লেখিত মোট ১৭টি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনকে মোটা দাগে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেগুলো হলো:

(১) **সাজাপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধীদের ভোটার হওয়ার যোগ্যতা রহিতকরণ:** এটি একটি ভাল পদক্ষেপ। তবে প্রশ্ন হলো: তারা কখন যোগ্যতা হারাবে? শাস্তি প্রদানের দিন থেকে? না আপিল শেষ হওয়ার পর থেকে?

(২) **নির্বাচনে ব্যয়সীমা বৃদ্ধিঃ** আরপিও'র প্রস্তাবিত সংশোধনীতে জামানতের পরিমান দশ থেকে ২০ হাজার টাকা করা হয়েছে। নির্বাচনী ব্যয় বর্তমানের ১৫ লাখ টাকা থেকে ২৫ লাখ টাকাতে বৃদ্ধি করা হয়েছে। অবাস্তব বলে মনে হলেও, আমরা মনে করি যে, ব্যয়সীমা বরং কমানো উচিৎ। কারণ এটি এক দিকে যেমন সাধারণ মানুষের প্রতি চরম বৈষম্যমূলক, আরেক দিকে এর মাধ্যমে নির্বাচনে বিরাজমান টাকার খেলার অবসান হবে না। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নির্বাচনে টাকার প্রভাব বন্ধ করার জন্য আজ জাতি হিসেবে আমাদেরকে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কলুষমুক্ত ও কার্যকর করতে হলে কমিশনকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। একই সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। প্রসঙ্গত, দলীয় প্রধানের নির্বাচনী ব্যয় তার নিজ ব্যয়সীমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করার বিধান নির্বাচনে টাকার খেলা বন্ধের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কোনোভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

(৩) **দণ্ডের বিধানে পরিবর্তনঃ** আরপিও'র প্রস্তাবিত সংশোধনীতে অনেকগুলো নির্বাচনী বিধিবিধান ভঙ্গের জন্য শাস্তির পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাহী ম্যাজিট্রেট দিয়ে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অভিযোগ নিস্পন্ন করা যাবে। কিন্তু নির্বাহী ম্যাজিট্রেটের শাস্তি দেওয়ার এখতিয়ার সীমিত এবং অতীতে দেখা গিয়েছে যে, তারা অপরাধীদেরকে সাধারণত সামান্য অর্থদণ্ড দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন। তাই গুরুতর নির্বাচনী অপরাধের জন্য অভিযুক্তরা লঘুদণ্ড ভোগ করে পার পেয়ে যেতে পারেন, যা অপরাধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া থেকে তাদেরকে বিরত রাখবে না। এ ছাড়াও বাংলাদেশের বর্তমান চরম দলীয়করণের সংস্কৃতিতে নির্বাহী ম্যাজিট্রেটদের নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা ও সুযোগ প্রায় অনুপস্থিত। ফলে অনেক ক্ষেত্রে অবিচার ও পক্ষপাতিত্ব হতে পারে।

(৪) **স্বতন্ত্র প্রার্থী সম্পর্কে পরিবর্তনঃ** বিদ্যমান আইনে কেউ স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে চাইলে তাকে এক-শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর সম্বলিত তালিকা মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে। সাবেক এমপিদের ক্ষেত্রে অবশ্য এ বিধান প্রযোজ্য নয় এবং তারা এ তালিকা দাখিল না করেই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করতে পারবেন।

অনেকেরই মনে আছে যে, গত নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত টাঙ্গাইল-৩ উপ-নির্বাচনে জনাব আমানুর রহমান খান রানা এক-শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর সম্বলিত তালিকাসহ তার মনোনয়নপত্র জমা দেন। একই সঙ্গে তিনি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মনোনয়নও চান। তিনি মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রাথী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচনে জিতেন। এ ধরনের 'বিদ্রোহী প্রার্থী'র সমস্যা দূর করার জন্য কমিশন প্রস্তাব করেছে যে, কোনো দলের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত প্রার্থীর নাম রিটানিং অফিসারের কাছে জমা দেওয়া হলে, অন্যসব প্রার্থীর, যারা দলের প্রাথমিকভাবে মনোনীত প্রার্থী হিসেবে দলের প্রত্যয়নপত্রসহ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, তাদের মনোনয়নপত্র আপনা থেকেই প্রত্যাহার হয়েছে বলে গণ্য হবে। ফলে নিবন্ধিত দলের মনোনয়ন চেয়ে এবং বঞ্চিত হয়ে জনাব রানার মত কেউ আর ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। এমনকি সাবেক এমপিরাও না।

কাউকে এমনভাবে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া থেকে বিরত রাখা হলে, তাদের গণতান্ত্রিক, এমনকি কারো কারো মতে তাদের মৌলিক অধিকার হরণ করা হবে। এ ছাড়াও এ ক্ষেত্রে আরেকটি আইনি জটিলতা রয়েছে। ভোট প্রদান একটি গোপনীয় বিষয়, যা নিশ্চিত করার জন্য আরপিওতে একাধিক বিধান রয়েছে। যেমন, ধারা-৮২ ও ৮৩ অনুযায়ী, ভোটের গোপনীয়তা ভঙ্গ করা একটি দণ্ডণীয় অপরাধ। তাই স্বতন্ত্র প্রার্থীকে তার সমর্থনকারীদের নাম প্রকাশে বাধ্য করা আরপিও'র সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে আমাদের ধারণা। উপরন্তু নাম প্রকাশের ফলে বড় দলের বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকরা হুমকির শিকার হতে পারেন।

(৫) **দলের বিদ্রোহী প্রার্থী সম্পর্কিত বিধানে পরিবর্তনঃ** কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধনীতে নিবন্ধিত দলের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের এখতিয়ার দলকে প্রদান করা হয়েছে। একই সঙ্গে দলের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম রিটার্নিং অফিসারের কাছে পৌঁছানোর সময় মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পূর্বের পরিবর্তে মনোয়নপত্র প্রত্যাহারের দিনকে ধার্য করা হয়েছে। অর্থাৎ অন্তিম মুহূর্তে এসে দলের চূড়ান্ত মনোনয়নের সিদ্ধান্ত জানা যাবে এবং কেউ এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করলেও কোনো লাভ হবে না। কারণ দল কর্তৃক চূড়ান্তভাবে মনোনীত ব্যক্তির নাম রিটার্নিং অফিসারের কাছে প্রেরণ করা হলে দলের প্রাথমিকভাবে মনোনীত এবং দলের প্রত্যয়নপত্র নিয়ে দাখিল করা অন্য সব মনোনয়নপত্র এরই মধ্যে বাতিল হয়ে যাবে।

বিদ্রোহী প্রার্থী নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আরপিও'র প্রস্তাবিত সংশোধনীর ফলে দলের কর্তা ব্যক্তিদের, বিশেষত আমাদের দুই বড় দলের প্রধানদের মনোনয়ন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হবে। যেহেতু বিদ্যমান আইনি বিধান অনুযায়ী [ধারা-৯০খ(১)(খ)(রা)] দলের তৃণমূল নেতাকর্মীদের তৈরি প্যানেল থেকে মনোনয়ন দিতে হবে না এবং মনোনয়ন প্রার্থীর ন্যূনতম তিন বছর দলের সদস্য থাকার বাধ্যবাধকতা [ধারা-(১)(ঞ)] মানা হয় না,

তাই আমাদের নেত্রীদ্বয় তাদের খেয়াল-খুশী মত যাকে ইচ্ছা তাকে মনোনয়ন দিতে পারবেন। কারণ, বাংলাদেশের বাস্তবতায় দলীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড নিতান্ত রাবার স্টাম্পিং বডি হিসেবে কাজ করে।

প্রসঙ্গত, গত নির্বাচন কমিশনের অধীনে (তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে) প্রণীত অধ্যাদেশে সংসদ নির্বাচনে নিবন্ধিত দলের মনোনয়ন নির্ধারণের জন্য এক ধরনের 'দলীয় প্রাইমারী'র ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থার অধীনে দলের স্থানীয় কমিটির মতামতের ভিত্তিতে তৈরি প্যানেল থেকে মনোনয়ন প্রদানের বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু নবম সংসদ কর্তৃক অধ্যাদেশটি অনুমোদনকালে এতে পরিবর্তন এনে প্যানেলটি বিবেচনায় নিয়ে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার বিধান করা হয়। ফলে দলীয় প্রধানরা দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষমতা আবার ফিরে পান এবং এ প্রক্রিয়ায় দলের তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা ক্ষমতাহীন হন।

এ ধরনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার ব্যবহার করে দলীয় প্রধানরা দলের যে কোনো মনোনয়ন প্রত্যাশীকেই, যে মনোনয়ন প্রত্যাশী দলের প্রত্যয়নপত্র নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, বঞ্চিত করতে পারবেন। এর ফলে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের দলীয় প্রধানদের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য মনোনয়নের প্রাপ্তির জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ডে পরিণত হবে। এ ধরনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে দলে অবশ্য বিদ্রোহও ঘটতে পারে। এ ছাড়াও এর মাধ্যমে মনোনয়ন বাণিজ্যের আরও বিস্তার ঘটবে এবং রাজনীতি আর ব্যবসা একাকার হয়ে যাবে।

বিদ্রোহী প্রার্থী বন্ধ করার পেছনে নির্বাচন কমিশনের যুক্তি হলো যে, এর ফলে রাজনৈতিক দলে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এ দায়িত্ব কমিশনের নয়। কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এর দায়িত্ব সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান, যাতে আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আরও কার্যকর হয় এবং এর দায়বদ্ধতা এদেশের ভোটারদের কাছে, রাজনৈতিক দলের কাছে নয়। এ ছাড়াও বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ার সুযোগ না থাকলে, নির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যা কমে যাবে এবং ভোটারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিধিও ছোট হয়ে আসবে। আর কম প্রার্থী মানে কম যোগ্য প্রার্থী এবং নির্বাচনে কম যোগ্য প্রার্থী দাঁড়ালে, স্বাভাবিকভাবেই কম যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হবেন। ফলে আমাদের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, নির্বাচন কমিশন নিজের ক্ষমতায়নের জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে নি। আর কমিশনের প্রস্তাব থেকেও অন্তত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব মন্ত্রণালয় মন্ত্রিসভায় প্রেরণ করে নি। ফলে আরপিও সংশোধনের কিছু বিধান মন্ত্রিসভা অনুমোদন করলেও, এর মাধ্যমে কমিশনের ক্ষমতা কোনোভাবেই বৃদ্ধি পাবে না, যদিও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের পর থেকেই সরকারের পক্ষ থেকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে কমিশনকে শক্তিশালী করার কথা বলা বার বার বলা হয়েছে। এ ছাড়াও বর্তমান কমিশনের নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতা নিয়েও অনেকের মনে গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে।

আরপিওতে সম্ভাব্য নতুন সংযোজন

সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আমরা আরপিও-তে আরও নতুন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করছি:

(১) আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সংজ্ঞায় বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের অন্তর্ভুক্তিকরণ।
(২) 'না' ভোটের বিধান পুন:প্রবর্তন করা এবং 'না' ভোট জয়ী হলে নতুন প্রার্থীর অংশগ্রহণে পুন:নির্বাচনের আয়োজন। প্রসঙ্গত, গতকাল ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট এক যুগান্তকারী রায়ে 'না' ভোটের তথা প্রার্থী প্রত্যাখ্যানের বিধানকে নাগরিকের মত প্রকাশের স্বাধীনতা – যা একটি মৌলিক অধিকার বলে আখ্যায়িত করেছেন।
(৩) হলফনামায় অসত্য ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রদান এবং তথ্য গোপনের জন্য বিজয়ী প্রার্থীর নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে প্রদান।
(৪) হলফনামার ছকে পরিবর্তন আনা। যেমন বয়স, পেশার সুস্পষ্ট বিবরণ, আয়ের উৎসের বিস্তারিত তথ্য, নিজের ও নির্ভরশীলদের সম্পদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা ও মূল্য উল্লেখ, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিকানার ও সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কের বিস্তারিত তথ্য, প্রার্থীর রাজনৈতিক পরিচিতি (দলবদলের তথ্যসহ অতীতের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিবরণী) ইত্যাদি সংযোজন। এর ফলে প্রার্থীরা তাদের আয়ের উৎসের বিস্তারিত বর্ণনা, সম্পদের মূল্য এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে তাদের মালিকানার তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য হবেন, যা ভোটারদের জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
(৫) নির্বাচনকালীন গুরুতর অসদাচরণের জন্য তদন্ত সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা প্রদান।
(৬) মনোনয়নপত্র ইলেকট্রনিক ফাইলিং-এর বিধান।
(৭) দলের নেতাকর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি সর্বোচ্চ তিন জনের প্যানেল থেকে মনোনয়ন প্রদানের বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি।
(৮) আইনটি বাংলায় ভাষান্তরকরণ।
(৯) ব্যালট পেপারে একই সঙ্গে মার্কা এবং প্রার্থীর ছবি ব্যবহার।

নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা সংক্রান্ত কিছু বিষয় সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী, ২৭ অক্টোবরের পর যে কোনো দিন দশম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের সক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের থাকার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কমিশনের সে সক্ষমতা আছে বলে মনে হয় না। উদাহরণস্বরূপ, গত জুলাই মাসের মধ্যের ভোটার তালিকা ছাপার কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও, এখন পর্যন্ত তা সম্পন্ন করা যায় নি। এ ছাড়াও ভোটার তালিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে। যেমন- এ মূহুর্তে বিতর্ক উঠেছে কমিশনের জাতীয় তথ্যভাণ্ডার এবং মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত ভোটার সংখ্যা নিয়ে – দুই উৎস থেকে প্রাপ্ত ভোটার সংখ্যার পার্থক্য প্রায় সাড়ে চার লাখ। এ ছাড়াও প্রবাসে কর্মরত লাখ লাখ বাংলাদেশিকে বাদ দিয়ে তৈরি ভোটার তালিকাকে কোনোভাবেই সঠিক ও পরিপূর্ণ তালিকা বলা যায় না। উপরন্তু মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার সম্প্রতি দাবি করেছেন যে, ভোটার তালিকার একটি অডিট করা হয়েছে, যার রিপোর্ট প্রকাশ করা জরুরি।

কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণ নিয়েও অনেকের মনে প্রশ্ন রয়েছে। গত ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নির্বাচনী এলাকার সীমানা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হবার কথা থাকলেও কমিশন তার প্রাথমিক সীমানা নির্ধারণের কাজটি ফেব্রুয়ারি মাসে সম্পন্ন করে। এটি নিয়েও ব্যাপক সমালোচনার ঝড় উঠে। এমনকি ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্যে দের পক্ষ থেকেই কমিশনের বিরুদ্ধে গুরুতর পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠে। সম্প্রতি কমিশন চূড়ান্ত সীমানা নির্ধারণের গেজেট প্রকাশ করেছে। কিন্তু আসনওয়ারী ভোটার সংখ্যার তথ্য কমিশন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে চূড়ান্ত সীমানা নির্ধারণের কাজটির যথার্থতা নিরীক্ষা করা যাচ্ছে না।

অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদেরকে নির্বাচনী অঙ্গন থেকে দূরে রাখার জন্য হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য এবং এগুলো যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করে দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু হলফনামার বিরাজমান ছকটি অসম্পূর্ণ এবং অকার্যকর। তাই এটিতে পরিবর্তন আনা দরকার, কিন্তু এ সম্পর্কে কমিশনের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। এ ছাড়াও কমিশন 'বিরুদ্ধ হলফনামা'র বিধান সম্বলিত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে, যার বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

পরিশেষে, নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এর জবাবদিহিতা জনগণের নিকট, কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে নয়। আর জনগণের নিকট এ দায়বদ্ধতার কাঠামোকে কার্যকারিতা দেওয়ার জন্য এ কমিশনের সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সাথে তার কার্যক্রম পরিচালনা করা দরকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কমিশনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনো প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। বরং কমিশনকে অতীতের গোপনীয়তার সংস্কৃতিই লালন করতে দেখা যায়। যেমন, রাজনৈতিক দলের হিসাব-নিকাশ প্রকাশ করতেও কমিশন অনাগ্রহী। জাতীয় স্বার্থে এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া অতি জরুরি।